বাগদাদ থেকে কুর্দিস্থান- কুর্দিস্থানের দিনগুলি

শোভন শামস্

ঢাকা থেকে বাগদাদ

নব্বই এর দশকের শেষভাবে ইরাক বিধ্বস্থ। আন্তর্জাতিক অবরোধ ইরাকীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ইরাক এয়ার ওয়েজের বিমান আকাশে উড়ে না। বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমান উড়া নিষিদ্ধ। বিচিত্র হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ইরাক যখন ঠিক এই সময়ে ঢাকা থেকে বাগদাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এক বছর ইরাকে থাকতে হবে তাই একই সাথে মানষিক প্রস্তুতিও নিচ্ছি। কুয়েত এয়ার ওয়েজে করে কুয়েত হয়ে বাগদাদ যেতে হবে। কুয়েতের ভিসা নেয়া হয়েছে। বাকী ব্যবস্থা কুয়েতে গেলে হবে আশা করা যাচ্ছে। যথা সময়ে বিমান দেশ ছেড়ে বিদেশের পথে উড়াল দিল। বিমানের সিটে গা এলিয়ে ভাবছিলাম আবার কতদিন পর দেশে ফিরব।

বিকেল বেলা কুয়েত বিমান বন্দরে নামলাম। বাইরে প্রচন্ড রোদ তবে বিমান বন্দরের ভেতর এসির ঠান্ডা আমেজ। আরব দেশে শীতকাল শুরু হবে হবে করছে। ডিউটি ফ্রি শপে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম তারপর ট্রানজিট লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলাম। যেখান থেকে আমাদের এয়ার পোর্টের সাফির হোটেলে নিয়ে গেল। কুয়েতে ট্রানজিট যাত্রীদের বাইরে যাওযার অনুমতি না থাকলে এই হোটেলে রাখা হয়। সন্ধ্যার দিকে হোটেলে এলাম। রুমগুলো সুন্দর। ভালই থাকার ব্যবস্থা। রিসেপশনে সন্ধ্যা সাতটার সময় ডিনারের জন্য ডাইনিং এ আসতে বলল। পরদিন ভোরের নাস্তা সকাল সাতটার মধ্যে শেষ করে আমাদের বাগদাদের বিমানে চড়তে হবে। রুমে ফ্রেস হয়ে হোটেলের লাউঞ্জে নেমে এলাম। চারিদিকে কাঁচ লাগানো, দুরে রানওয়েতে প্লেনের উঠানামা দেখা যাচ্ছে। আসে পাশে কুয়েত বিমান বাহিনীর অনেক বিমান হ্যাংগারে রাখা । দুরে হাইওয়ে দিয়ে কুয়েত শহরের দিকে গাড়ী চলছে। চারিদিকে রুক্ষ মরুময় দৃশ্য, গাছপালা ও সবুজের অনুপস্থিতিতে চোখে কেমন যেন ধাক্কা লাগে। রিসিপশনে বেশ কয়েকটা দোকান। কসমেটিকস,ঘড়ি ও নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিষ সেখানে পাওয়া যায়। সেলস গার্লগুলো সবই ফিলিপিনো। স্থানীয় মালিক কিংবা কুয়েতি ম্যানেজারদের সাথে চোখে চোখে কথা বলছে। কলকল করে হাসছে। তাদের ঢলাঢলি বেশ চোখে পড়ার মত। ডিনারে যাওয়ার আগে এক সেলস গার্লকে নিয়ে এক কুয়েতি গাড়ী করে হাওয়া হয়ে গেল। বুফে সিস্টেমে ডিনার, বেশ অনেক আইটেম। খেতে

বসতেই দেখলাম একজন ওয়েটার আমাদের পাশে ঘোরাঘুরি করছে। কাছে ডাকলাম, বাংলাদেশের ছেলে। আমাদেরকে দেখে ও কথা বলতে পেরে বেশ খুশী হলো। কোন কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করল, সবই আছে তাই তাকে ব্যস্ত হতে মানা করলাম। তারপরও সে আমাদের জন্য স্পেশাল কিছু করতে চায়। খাওয়া শেষে কোথা থেকে মজার মজার কিছু ডেজার্ট ও ফল এনে দিল। রুমে নিয়ে খেতে বলল কিছু ফল। তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম তার যদি কোন সমস্যা হয়,একথা বলাতে বলল, সে এই শিফটের দায়িত্বে আছে। হোটেলে বাংলাদেশী বোর্ডার তেমন পায় না তাই আমাদের দেখে তার আবেগ সামলাতে পারেনি। দেশের কথা শুনতে পেরে তার প্রচন্ড আনন্দ হচ্ছে আজ। আমরাও তার আনন্দমাখা মুখ দেখে রুমে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ টিভি দেখে ঘুম। ভোরবেলা উঠে জানালা দিয়ে একটু ঘোলাটে সকাল দেখছিলাম। তখনো সূর্য উঠেনি। দেশে এ সময়টা বেশ পবিত্র পবিত্র লাগে এখানে কেমন যেন কুয়াশা কুয়াশা ভাব। সকালে নাস্তা সেরে মাইক্রোবাসে করে বাগদাদ গামী বিমানে চড়ে বসলাম। প্রায় দুই ঘন্টা রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ার পর বিমান হাব্বানিয়া সামরিক বিমান ঘাটিতে নামল। স্থানীয় সময় তখন সকাল এগারোটা। আসার পথে নীচে মরুভূমির মধ্যে ইরাক কুয়েত যুদ্ধের সময় ইরাকীদের ফেলে যাওয়া ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া ট্যাংক, জীপ, ট্রাক ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখলাম। কাল কাল দাগ দেখে বোঝা যাচ্চিল এগুলো বোমার আঘাতে ও আগুনে জ্বলে গেছে। সারা পথে কোন সবুজের চিহ্ন নেই। মানুষজন এত উপর থেকে দেখা যায় না তেমন জনপদ ও দেখিনি। একঘেয়ে দৃশ্য কিছুক্ষণ দেখে আর দেখতে ইচ্ছা করেনি তাই চোখ বন্ধ করে তন্দ্রার চেষ্টা করছিলাম।

বিমান থেকে নেমে একটা গরমের হলকা অনুভব করলাম। তাপমাত্রা বেশ বাইরে। দুরে রানওয়েতে মরিচিকা দেখা যাচ্ছে। ইরাকী যুদ্ধ বিমান গুলো নো ফ্লাই জোনের কারনে উড়তে না পেরে মাটিতে গর্জন করছে। কতগুলো ধ্বংসও হয়ে গেছে দেখলাম। বিশাল বিমান ঘাটি। মাটির নীচে প্লেন রাখার জন্য বাংকার আছে। কোন কোনটা দোতালা। তেল পোড়া কটু গন্ধ ভাসছে চারিদিকে বিমান গুলোর একজষ্ট থেকে বের হওয়া ধোঁয়া বদ্ধ মরুভুমির বাতাস ভারী করে তুলছে।

নামার পর কাষ্টমস চেকিং, হেলে দুলে ইরাকী কাষ্টমস অফিসাররা বিদেশীদের মালপত্র চেক করছে,তাদের কোন তাড়া নেই। ঘন্টাখানেক পর সব ফর্মালিটিজ শেষ করে বাইরে এলাম। মালপত্র ভ্যানে তুলে দিয়ে এসি কোষ্টারে বসলাম। এয়ার পোর্ট থেকে আমাদের বাস বাগদাদের পথে চলা শুরু করল। বিশাল এয়ার পোর্ট । বিভিন্ন অলি গলির চওড়া রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে বাইরে এলাম। বাইরে খোলা মরুভূমির বাতাস একটু স্নিগ্ধ মনে হলো। কাছেই হাব্বানিয়া শহর। এক সময় এই শহর বিখ্যাত টুরিষ্ট স্পট ছিল। এখানে টুরিষ্ট ভিলেজ , সুইমিং পুল, হোটেল , রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি পরিকল্পিত উপায়ে বানানো রয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তী ইরাকে এগুলো এখন

পরিত্যক্ত। পর্যটকরা এই দুঃখ জাগানিয়া দেশে কেন আসবে। ইরাকে আনন্দের অবশিষ্ট আর কিই বা আছে। গাড়ী দ্রুত বেগে চলছে। রাস্তাগুলো বিশাল পিচঢালা, মাঝে মাঝে একটু খারাপ হলেও বেশ মজবুত ভাবে বানানো। কিছুক্ষণ চলার পর একটা জনপদে ঢুকে পড়লাম। শহরে অল্প কিছু মানুষ,মুখে হাসি নেই। হেঁটে চলছে কিন্তু যেন প্রানহীন মলিন। দোকান পাট দেখা যাচ্ছে কিছু খোলা কিছু বন্ধ। এই দুপুরের গরমে মানুষ কিছু কিছু বাইরে হাটছে তবে সংখ্যা হাতে গোনা,বাগদাদ শহরের কাছে যতই আসছে ততই ফ্লাই ওভার,মোটর ওয়ে দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমি দেশগুলোর মত বিভিন্ন শহরের নাম ও দুরত্ব রাস্তার উপর বোর্ডে লিখা রয়েছে। কোন শহরে কোন এক্সিট দিয়ে বের হতে হবে তা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে। একটু বেখেয়াল হলে ২০/৩০ কিলোমিটার পথ ঘুরে আবার সেই জায়গায় আসতে হবে। সব ওয়ানওয়ে রোড,ড্রাইভার একশ কিলোমিটারের বেশী স্পিড়ে গাড়ী চালাচ্ছে। সোমালীয় ড্রাইভার, আরবী ভাষা ভাষী চুপচাপ নিজ মনে চালিয়ে যাচ্ছে। আরবী একটা গান বাজছে ক্যাসেটে। আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ নগরীতে চলে এলাম। বিশাল বিশাল রাস্তা বিশাল এলাকা নিয়ে নানা মনুমেন্ট জায়গার যেমন কমতি নেই তেমনি বিশাল বিশাল মুনমেন্ট গুলোও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। কোথাও অর্ধ সমাপ্ত দোতলা তিনতলা রাস্তা। পাঞ্চাশ বছরের নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এসব বানানো হচ্ছিল। যুদ্ধ সব থামিয়ে দিয়েছে। বাগদাদ এখন আর সেই লাস্যময়ী নয়। জীবন সংগ্রামে কোন মতে ধুকে ধুকে বাদদাদ বেঁচে রয়েছে। প্রানোচ্ছল সেই বাগদাদ নগরীর কথা অনেক শুনেছিলাম,বাস্তবের বাগদাদ দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। ক্যানাল হোটেলে এসে নামলাম। এখানে বিভিন্ন ফর্মালিটিজ শেষে কারাদা দাখেলে গেলাম। এই রাস্তার পাশে বেশ কিছু হোটেল আছে। আপাতত এগুলোর যে কোন একটাতে কয়েক দিন কাটাতে হবে।

হে দুখিনী ইরাক তোমার দুঃখ বাড়াতে নয়
সুদিনের ফেলে আসা কিংবা অদেখা অজানা সুখের আশায় নয়
তোমাকে অনুভবে পেতে চেয়েছি তোমার দুঃসময়ে
সমব্যাথীর মমতায় সহানুভুতি ও সহৃদয়তায়।

বাগদাদে এক সন্ধ্যায়

তাইগ্রিস নদী , বাগদাদ

বাগদাদে আমার সাময়িক আশ্রয় হোটেল কান্দিল, ইরাকী ভাষায় ফন্দুক কান্দিল। এটা কারাদা দাখিল রাস্তার পার্শ্বে । হোটেলে এসি ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশী শোনাতে রিসেপশনের লোকজন বেশ খুশী , মুসলিম ব্রাদার। একটু একটু ঠান্ডা ছিল আবহাওয়া । সাথে শীতের প্রস্তুতি আছে । বাংলাদেশ থেকে কুয়েত হয়ে ইরাকের হাব্বানিয়া বিমান বন্দরে এসে পৌছাই। সেখান থেকে গাড়ীতে চড়ে বাগদাদ।

একটু ফ্রেস হতে হতে সন্ধা হয়ে গেল। আমরা কয়েকজন বাগদাদের রাস্তায় ঘুরতে বের হলাম। মানুষজন রাস্তায় তেমন নেই । আমাদের আরবী ভাষার জ্ঞান প্রায় শুন্য। মানুষের সাথে ইংরেজীতে কথা বলার চেষ্টা করি। হোটেল কারাদা ইন বা কারাদা দাখেল রাস্তার পাশে। কান্দিল হোটেল বা ফন্দুক কান্দিল থেকে কিছু দুর এগিয়ে গেলেই আলী বাবা স্কোয়ার।

কাহারমানা

আরব্য উপন্যাসের সেই আলীবাবা চলিশ চোর গল্পের মার্জানার কথা কে না জানে। এখানেই সেই কাহারমানা বা মার্জানার স্থাপনা। ইরাকী স্থপতি মোহাম্মদ গানি এটার স্থপতি। এখানে চললিশটা বড় লোহার পাত্রের উপর মার্জানা দাড়িয়ে আছে। মার্জানার হাতের পাত্র থেকে গরম তেল ঢালার

দৃশ্য। এই মনুমেন্টে সেই গরম তেলের বদলে পানির ফোয়ারা নামছে মার্জানার পাত্র থেকে। রাতের বেলা এটা আলোকিত থাকে এবং অপূর্ব আরব্য রজনীর দৃশ্য ফুটে উঠে।

বড় রাস্তায় এসে আমরা খাবারের সন্ধানে বের হলাম । খাবারের দোকানও পেয়ে গেলাম । দুম্বার মাংস দিয়ে সোয়ার্মা , সালাদসহ এক ধরণের লম্বা বনরুটির ভিতর মাংস কেটে ভরে দিচ্ছে । রুটিকে এরা খবুজ বলে । ২৫০ দিনার দাম। এক ডলারে প্রায় ১৮৫০-১৯৫০ ইরাকী দিনার। বাগদাদে এগুলোকে ওরা ছাপানো টাকা বলে। আর কুর্দিস্থানে এক ডলারে পেতাম ২৫ দিনার , এটাকে বলে সুইস মানি, পুরানো ইরাকী টাকা । ইরাক ইরান যুদ্ধের আগে এক দিনার ছিল তিন দশমিক তিন ডলার । হায়রে অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি ! একটা সভ্য, উন্নত ও ধনী জাতি কিভাবে তিলে তিলে অভাব সহ্য করছে এটা তখনকার ইরাকে না গেলে বোঝা যেত না। আমাদেরকে দেখে লোকজন বলল কোন দেশের? জানালাম বাংলাদেশ। ওরা বলে ইন্ডিয়ার কাছে, ভারতীয় বা হিন্ডিয়া । মুসলমান বলাতে বেশ খুশী। স্বাগত জানালো । লম্বা চওড়া মানুষগুলো, মুখে সুখের ছাপ নেই । অসুখী চেহারা নিয়ে জীবন টেনে নিয়ে যাচ্ছে । রাতের খাবারে খেলাম সোয়ার্মা ও খবুজ দিয়ে, সাথে ইরাকী কোকাকোলার মত পানীয়, বেশ মজা, এটার দাম ২০০ দিনার, ভালই লাগল । বিভিন্ন ফ্লেভারের আছে , লেমনটা বেশ মজার। এরপর ফুটপাত দিয়ে হাটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। ফুটপাতে বই বিক্রি হচ্ছে, ইরাকী বই, আরবী ইংরাজী সব ধরনের । আরবী শিখার একটা বই কিনলাম । বই পড়ার সখ বরাবরের । এবার আরব দেশে এসে আরবী শিখতে ইচ্ছা করল । রাস্তার ফুটপাতে বসে মানুষজন খেলনা, চকলেট,বিস্কিট বিক্রি করছে । আমাদের দেশের মত এত হকার ও ক্রেতা নাই। মানুষ তাদের নিজেদের ঘর এর আসবাব পত্র ও নিয়ে এসেছে বিক্রির জন্য । অভাবের একটা নগ্ন রুপ দেখলাম । তবে এরা ধৈর্য্য ধরে আছে । মুখে দুঃখের কথা বা অভাব বলে না , দেখে বুঝা যায় ।

বাগদাদের সুখের সময়ের রুপের চমক দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবুও ইরাকে প্রবাস জীবন যাপন কালে যা দেখেছি তাই মোহিত করেছে এই মনকে। একটার পর একটা যুদ্ধ ও অবরোধ না থাকলে এই দেশটা যে কতদুর চলে যেত তা সহজেই বোঝা যায়। রাস্তাগুলো ফ্রান্স ও জার্মান নির্মানকারী প্রতিষ্ঠান গুলো পঞ্চাশ বৎসরের পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী শুরু করেছিল। একতলা দোতলা রাস্তার পর তৃতীয় তলায় এসে কাজ থমকে গেছে। কত আন্ডার পাস ও ফ্লাই ওভার যে আছে বাগদাদ শহরে তা হিসাব করিনি। যুদ্ধ ও সঠিক নেতৃত্বের অভাব, একটা প্রানপ্রাচুর্যে ভরা নগরীকে নীরস দুঃখ জাগানিয়া নগরীতে পরিনত করে। বাগদাদ যেন তারই প্রতিমূর্তি।

তাইগ্রিস নদী , বাগদাদ

আবু নাওয়াজ সড়ক, বাগদাদ

<u>বড় পীড় (র) সাহেবের মাজার ও মসজিদ</u>

বাগদাদে আসলেই জুম্মার নামাজ বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র) এর মসজিদে পড়ার চেষ্টা করতাম। বড়পীর (র) সাহেবের মাজারে যাওয়ার কথা শুনলেই মনটা ভরে যেত। হোটেল থেকে টেক্সি নিয়ে চলে আসতাম এখানে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আব্দুল কাদের জিলানী (র) বললেই জায়গামত পৌছে যেতাম। টেক্সি ভাড়া ৫০০ দিনার লাগত আমাদে টাকায় ১২ টাকা বেশ সস্তা। মাজারের পাশেই মসজিদ। মসজিদে ঢুকার পথে ফেরীওয়ালারা আতর তসবিহ,তবারক ইত্যাদি নানা জিনিষপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছে। একটু এগিয়ে গেলে মসজিদের মূল পথ ও ওযু করার জাযগা। মসজিদের মধ্যে ভেতরে বিশাল চত্বর। জুম্মার দিনে মানুষ পূর্ণ হয়ে যায়। চত্বরের পেছনে আবাসিক এলাকা ছাত্রদের থাকার জন্য। সেখানে যাওয়া হয়নি।

বড়পীর (র) মাজার মসজিদের একপার্শ্বে বিশেষ বিশেষ সময়ে তা খোলা হয়। তখন দর্শনার্থীরা ভেতরে গিয়ে মাজারের চারপাশ ঘুরে আসে ও রুহের মাগফেরাত কামনা করে। অতি আবেগ প্রবণ মানুষ মাঝে মাঝে রওযায় চুমু খায় ও বেষ্টনী ধরে দাড়িয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করে। পুলিশ বেশ রুঢ ভাবে তাদের সরিয়ে দেয়। সাধারণত জুম্মার নামাজের পর কিছুক্ষণের জন্য মাজর খোলা হয়। আগে থেকে দাঁড়িয়ে না থাকলে ভিতর চাপে ঢোকা বেশ কষ্টকর হয়। বাগদাদে থাকা কালিন মোটামুটি প্রায় সব জুম্মার নামাজ এই মসজিদে পড়ার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছিলেন। জুম্মাবার ১২ টার আগেই মসজিদ ও তার আশপাশের এলাকা মুসল্লীতে ভরে যায়। তাই ট্যাক্সি নিয়ে আমরা আগেই চলে এসেছি। এতক্ষনে মসজিদ ভরে গিয়ে বাইরের বিশাল চত্বরে মানুষ ঢুকছে কিছু কিছু মসল্লী ওজুর জন্য দাড়িয়ে আছে। এই মসজিদের একজন খাদেম বাংলাদেশী। বেশ বয়স্ক প্রায় ৪০ বৎসর ধরে এই মসজিদে খিদমত করে আসছেন। আমরা দলে কয়েকজন হওয়াতে ও কথা শুনে তিনি

এগিয়ে এসেছেন। তিনি আরবী ভাষয় সুন্দর ভাবে কথা বলেন তবে বাংলা ভুলে যাননি। সালাম দিয়ে তার খোজ খবর জিজ্ঞাসা করলাম। এদেশের করুন অবস্থাতেও তিনি মোটামুটি জীবনযাপন করছেন। স্ত্রী ও বেশ কয়েকজন সন্তান আছে তাঁর। দেশে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি। মেয়েদেরকে স্থানীয় ছেলেদের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরাও এদেশীয় মেয়েকে বিয়ে করেছে। দিন কেটে যাচ্ছে। আমাদেরকে উপহার দিতে চাইলেন। আমরাও তাঁকে কিছু উপহার দিলাম। তিনি আতর দিলেন ও দোকান গুলোতে নিয়ে গিয়ে ভাল দামে আমাদের পছন্দের জিনিষ কিনতে সাহায্য করলেন। জুম্মার নামাজ শেষে আমরা মসজিদের ভেতরে ঢুকি এতক্ষনে কিছু জায়গা ফাঁকা হয়েছে। তবে অনেক আগ্রহী মুসল্লী মাজার যেয়ারতের জন্য অপেক্ষা করছে। মসজিদের ভিতর কার্পেট বিছানো কোরান শরীফ আছে কেউ কেউ কোরান পড়ছে। খাদেম দরজা খুলে দেয়ার সাথে সাথেই ভিড় উপছে পড়ছে মাজারের ভেতরে যাওয়ার জন্য ভীড়ের মধ্যে ভেতরে ঢুকতেই চোখে আপনা আপনি পানি চলে এলো। এটা ভক্তি না ভালবাসায় বুঝতে পারলাম না। ছোট বেলা থেকে বড়পীর (র) নাম শুনেছি আজ তাঁর রওজা মোবারক দেখার সৌভাগ্য আল্লাহ দিলেন। আল্লাহর কাছে অশেষ শোকর, আমিন, ইরাকে থাকাকালীন মাজারের ভিতর ২ বার যেতে পেরে ছিলাম বলে নিজেকে বেশ সৌভাগ্যবান মনে করেছি। আল্লার কাছে যাবার জন্য দোয়া চাইলাম মনটা ভরে গেল।

ইরাকে এই মাজারকে আল কাদেরিয়া মাজার বলে। এটা আল রুসাফা এলাকার বাব আল শেখ এ অবস্থিত। বাব আল শেখ,শেখ আব্দুল কাদের আল জিলানী (র) এর নামানুসারে রাখা হয়েছে। এই জায়গাটা একসময় হাম্বলী ইসলামী ব্যক্তিত্ব শেখ মুবারক বিন আলী বিন আল দু সাইন আবু সাইদ আল মাখরুমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুল (ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের) ছিল। পরবর্তীতে এই স্কুলটার কলেবর বৃদ্ধি ও এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেন প্রসিদ্ধ ইমাম বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) । ১০৭৭ সালে তিনি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণের জিলান নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেণ। যুবক বয়সে তিনি বাগদাদে আসেন এবং বাগদাদের দনী গরীব নির্বিশেষে সবাই তাকে সাদরে গ্রহন করে। পরবর্তীতে তিনি একজন খ্যাতিমান শিক্ষদক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব হয়ে সুনামের সাথে তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিতরণ করেন। ১১৬৬ সালে হিজরী ৫৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং স্কুলের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে এটা একটা মসজিদে রুপান্তির হয় এবং বাগদাদের অন্যতম বৃহৎ মসজিদগুলোর একটাতে পরিণত হয়।

এই মসজিদের উন্নয়ন বিভিন্ন সময়ে ধাপে ধাপে হয়েছে। সবচেয়ে বড় ধরণের সংযোজন হয় ১৫৩৪ সালে । এ সময় সুন্দর ও বিশাল গম্বুজ নির্মান করা হয়। এটা ইট ও জিপসাম দ্বারা নির্মিত ইরাকের সর্ববৃহত গম্বুজ। এটা এখন ও বর্তমান। ১৮৯৮ সালে এই মসজিদে একটা বিশাল টাওয়ার তৈরী করে একটা ঘড়ি লাগানো হয়েছিল। টাওয়ারটা ইরাকের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আব্দুর রহমান আল নাকিব নির্মাণ করেছিলেন এবং ঘড়িটা বোম্বের বিখ্যাত পুনা ওয়ার্কশপে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা ৩০ মিটার উচু এবং এখন পর্যন্ত একনাগাড়ে সময় দিয়ে চলছে। ১৯৭০ সালে এই মসজিদের আরো উন্নয়ন হয়েছে এবং নীল ও সাদা গম্বুজ দুটো আরো সুন্দর করে এটাকে দৃষ্টিনন্দন ইসলামিক স্থাপত্যে রুপান্তর করা হয়েছে।

নিজেকে ভাগ্যমান মনে করি আল্লাহতায়ালা এই মাজার ও মসজিদ দেখার ও এতে নামাজ পড়ার তৌফিক দেয়ার জন্য।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) মসজিদের ভেতরে

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মাজার ও মসজিদ

আমাদের হানাফী মাজহাবের শ্রদ্ধেয় ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মাজার ও মসজিদ বাগদাদে আল ইমাম আল আদহাম মসজিদ হিসেবে সুপরিচিত। যখনই জানতে পারলাম তাঁর মাজার বাগদাদে তখনই আর দেরী না করে মাজার যেয়ারতের জন্য মনটা আকুল হলো। বিকেল বেলা আছরের পর সময় করে একদিন টেক্সি নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মাজার ও মসজিদ এলাকায় পৌঁছে গেলাম। বিশাল এলাকা নিয়ে দৃষ্টি নন্দন মসজিদ। শেষ বিকেলে আমরা যখন মসজিদে যাই তখন লোকজন একেবারেই ছিল না। প্রবেশ করার জন্য গেইট খুলে নিজেরাই ভিতরে যাই। প্রথমেই বিশাল খোলা চত্বর এবং এরপর মূল মসজিদ। একজন খাদেমকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। আমরা সালাম দিয়ে বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। হাসিমুখে তিনি আমাদের ভেতরে যেতে বললেন। সুন্দর সাজানো মসজিদ,কার্পেট মোড়া সাথে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মাজার। এই মসজিদ ও মাজার বাগদাদের আবু হানিফা এবং আল আদহামিয়া জেলায় অবস্থিত। কথিত আছে ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে (১৫০ হিজরী) যখন ইমাম আদহাম আবু হানিফা আল নুমান বিন থাবিত আল কুফী মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁকে এখানে দাফন করা হয় এবং তারপর থেকে জায়গাটার এই নামকরণ করা হয়।

আমরা নিজেদের হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে জানি তাই আমাদের ইমাম এর মাজার যিয়ারত করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। ইমাম আবু হানিফা ৭০১ সালে কুফা নগরে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি রসুল (সঃ) এর কতিপয় বয়জেষ্ঠ সাহাবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান এবং তাদের নিকট হতে সরাসরি জ্ঞান লাভ করেন পরবর্তীতে তিনি কুফাতে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার শুরু করেন এবং ইসলামের একজন জ্ঞানীন হিসেবে ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হানাফী মাজহাব এর প্রবর্তন করেন।

ইমান আবু হানিফা (রঃ) মাজার বর্তমান অবস্থায় আসার আগে নানা ধরনের স্থাপত্যের ধাপ অতিক্রম করে এসেছে। ১০৬৬ সালে সুলতান আরসালান এর সময় এর কিছু সংস্কার করা হয় এবং

একটা বিশাল গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬৩৮ সালে বর্তমান মসজিদের গম্বুজটি নির্মিত হয়। বর্তমান মসজিদটি ১৮৭১ সালে নির্মিত হয় মাজার সংলগ্ন এলাকাতে এবং ১৯০৩ সালে এটাকে সংস্কার করা হয়। ১৯৪৮ সালে এর বাইরের আচ্ছাদিত পথ তৈরী করা হয় যা পেছনে মসজিদটিকে বেষ্টন করে আছে। এই মসজিদের একটা অতি গুরুত্ব পূর্ণ দৃষ্টিনন্দন দিক হলো এর বিশাল ঘড়ি। এই ঘড়িটা ১৯২১-২৯ সাল নাগাদ নির্মিত এবং ১৯৫৮ সালে বর্তমান অবস্থানে এটাকে স্থাপন করা হয়। এটা প্রয়াত আব্দুল রাজ্জাক মাসুব আল আদহামি তাঁর নিজস্ব ওয়ার্কশপে নির্মান করেন এবং এর নির্মাণ স্থানীয় কাঁচামাল ও শ্রমিক দ্বারাই হয়েছিল। বর্তমানে এটা বাগদাদের অন্যতম প্রধান মসজিদ ও মাজার। বর্তমানে ইরাকের অবস্থা এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকায় পর্যটক অনেক কম আসাতে জন সমাগম কম। তবে এখানে সবসময় পর্যটকের আনাগোনা চলছেই। আছরের নামাজ শেষে আমরা এক মনে মাজারের পবিত্র জায়গায় দাড়িয়ে দোয়া করলাম। মসজিদ বিশাল এলাকা নিয়ে তাই আস্তে আস্তে আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সুন্দর ভাবে সাজানো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভীষণ নিঃস্তব্দ। এখানেই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন হানাফী মাজহাবের প্রবক্তা ইমাম আবু হানিফা (রঃ) । আল্লাহ তাঁর বিদেহী আত্মাকে শান্তিতে রাখুক আমিন। মাজার, মসজিদ দেখে ও যিয়ারত করে প্রশান্তিতে ভরে উঠা মন নিয়ে হোটেলে ফিরে আসি।

ইরাকে ভাগ্যাহত এক বাংলাদেশী

সোলেমানিয়া থেকে ইরবিল হয়ে বাগদাদে প্রথম ছুটিতে আসলাম প্রায় তিনমাস পর। এবার নতুন একটা হোটেলে উঠলাম। আগের হোটেলের কাছেই ফন্দুফ আল জোহরা বা জোহরা হোটেল। বেশ সুন্দর হোটেল তবে বহু বছর নিয়মিত গেষ্ট না থাকাতে যা হয় তাই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কেমন যেন নিষ্প্রান ভাব। এবার কিছু কিছু গেষ্ট আসাতে হোটেলটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। দুই চারজন করে কর্মচারী কাজে যোগ দিচ্ছে। লিফটে করে রিসিপশন থেকে আমাদের ফ্লোরে এলাম। বেশ বড় রুম এসি ও অন্যান্য সব কিছু আধুনিক তবে ছোয়ার অভাবে এখানেও ম্লান ভাব। হোটেলে এসে একটু গুছিয়ে বের হব তখনই রিং বেজে উঠলো। রিসিপশন থেকে জানালো নীচে একজন বাংলাদেশী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা নীচে নেমে আসলাম। নীচে নেমে বাংলাদেশী মানুষ বাগদাদে দেখে অবাক। পরিচয় হলো তার নাম আরমান সাথে সাথেই আরমান ভাই হয়ে গেলেন। প্রায় ১০ বছর হলো তিনি ইরাকে আছেন। প্রথমে কোন একটা কোম্পানীতে চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন তখন ইরাকের রমরমা অবস্থা। তার পরই নেমে এলো দুর্ভাগ্যের মেঘ। ইরাক - ইরাণ যুদ্ধ শুরু হলো। কোম্পানী গুলো তাদের ব্যবসা আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেয়া শুরু করল। বিদেশী শ্রমিক ছাটাই শুরু হলো। এক সময় প্রায় সব বিদেশীকে দেশে পাঠানো হলো। আরমান ভাই ততদিনে নিজেই আরবী ভাষা শিখে বাগদাদে মোটামুটি স্বাবলম্ভি হয়ে গেছেন। ছোট খাট

ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছেন এবং দেশে টাকা পাঠাচ্ছেন সবাই খুশী তার ও ব্যবস্যা দিন দিন বেড়ে গিয়েছিল। দেশের অর্থনীতির যে এই করুন অবস্থা হবে তা কোন ইরাকী স্বপ্নেও হয়ত ভাবেনি। কারণ তাদের জন্মের পর থেকে অভাব কি জানতই না। আরমান ভাই টাকা জমাতে জমাতে প্রায় চল্লিশ হাজার দিনার জমিয়ে ফেলল ব্যাংকে। তিনিও ভাবেনি এত দামী দিনার পানির দামে বিক্রয় হবে। তখন এক দিনার তিন দশমিক তিন আমেরিকান ডলার। ১৯৯৬ - ৯৭ তে ১ ডলার দিয়ে প্রায় ২০০০ দিনার এবং কমপক্ষে ৯৯০ দিনার পাওয়া যেত। আরমান ভাই এর জমানো টাকার কোন দামই রইল না। রক্ত দিয়ে উপার্জিত সেই অর্থের টানে তিনি আর দেশে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছিলেন না। কি নিয়ে যাবেন কি বলবেন সবাইকে। ইরাকে বিদেশীদেরকেও থাকতে দিচ্ছে না। তবে ভাল ইরাকীও অনেক আছে। তাদের অনুরোধ করে মাটি কামড়ে দুঃখ ব্যাথা সয়ে তিনি এবং তার মতো আরো অনেকে ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় ঠিকানা বিহীন অবস্থায় কোন রকম জীবন যাপন করছেন। বাংলাদেশীরা বাগদাদে আসাতে তিনি যেন প্রান ফিরে পাচ্ছিলেন। আমাদের জন্য কি করবেন

বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আমরা তার অবস্থা ভেবে তাকে বললাম আমাদের গাইড হিসেবে থাকতে। তারপরও এটা ওটা তিনি কিনে দিতে চান। আমরা আপত্তি করি মাঝে মাঝে মন খারাপ করেন। বাগদাদ আসলেই আরমান ভাই এসে দেখা করতেন। আগেই হোটেলের বন্দোবস্ত করে রাখতেন। হোটেল আগে ঠিক করে রাখাতে হতো কারণ ইরাক সরকার বিদেশীদের জন্য কয়েকটা দামী ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। এই হোটেল গুলোতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল বেশ ভাল এবং এখানে বসবাস কারীরা যেখানেই যেত নিরাপত্তার লোকজন তাদের আশেপাশেই থাকত। এছাড়া অন্যান্য হোটেলে থাকা আউট অব বাউন্ড। ধরা পড়লে হোটেল কর্তৃপক্ষ ও বিদেশী গেষ্ট সবারই সমস্যা হবে। ৫ তারা হোটেল গুলোর ভাড়া ২০০-২৫০ আমেরিকান ডলার অথচ বাগদাদে ২০-২৫ ডলারে ভাল হোটেল ছিল তখন। আমরা তাই ৫ তারা বাদ দিয়ে অন্য হোটেল গুলোতে উঠতাম। বাংলাদেশের মানুষ এবং মুসলমান হিসেবে আমরা হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ সুবিধাও পেতাম। বুঝতাম যে পুলিশ এ ব্যাপারে জানে তবে আমাদের জন্য এসব নিয়মকানুন আনঅফিসিয়ালি কিছু শিথিল করে দিয়েছিল ইরাকী কর্তৃপক্ষ।

আরমান ভাই আমাদের নিয়ে নিত্য নতুন জায়গায় যেতেন। আরবী চমৎকার বলতে পারতেন কাজেই কোন সমস্যা ছিল না। আমরা দেশে আসার সময় আরমান ভাই চিঠি ও মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতেন পরিবারের কাছে আমরা যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করতাম। এগুলো নিয়ে যেতে ও দেশের খবর এনে দেয়ার ব্যাপারে। একবার তিনি আমাদের বেশ ভাল করেই ধরলেন তার বাসায় যেতেই হবে। আমরা যতই না বলি তিনি ততই অভিমান করেন শেষমেষ রাজি হলাম। বিকালের দিকে ট্যাক্সি করে তার ডেরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শহর ছাড়িয়ে বেশ দুরে একটা ফ্যাক্টরীতে তিনি কোন রকম দিন গুজরান করেন যথাসময়ে ফ্যাক্টরীর সামনে চলে এলাম।

বর্তমানে তা বন্ধ তবে বোঝা যায় এক সময় বিশাল কর্মকান্ড চলত এখানে। বিশাল এলাকা জুড়ে মিল ও গোডাউন আমরা হেটে হেটে একটা গ্যারেজ এর কাছে গেলাম এটার দোতলায় কষ্ট করে ৪/৫ জন বাংলাদেশী এক সাথে থাকে। কোন কিছু উপার্জন করে সবাই মিলে বেশ কষ্টে দিন পার করেন। কথায় বলে বাংগালীর আন্তরিকতার অভাব নেই। আমরা অবাক হয়ে গেলাম আমাদের জন্য বাগদাদে ইলিস মাছ,বেগুন রান্না কোক, মাংস পোলাউ ইত্যাদির বিশাল আয়োজন দেখে খুবই আন্তরিকতার সাথে গল্প করে খেয়ে সময় কাটালাম। রাত্রি নেমে এসেছিল সবাই মিলে কিছুক্ষণ হাঁটলামও গল্প হলো। শেষে ট্যাক্সি

নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ট্যাক্সি ওই এলাকাতে কম বলে হেঁটে মূল রাস্তায় এসেছিলাম। এখনো ইরাকের অবস্থা ফিরেনি। তাই আরমান ভাইয়ের মত অনেকে হয়ত সেখানে সুদিনের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। একদিন হয়ত তাদের স্বপ্ন সফল হবে। তাদের সেই সঞ্চিত অর্থ তার পূর্ব মূল্যে পাবে এবং দেশে ফিরে তারা পারিবার পরিজন নিয়ে সুখে দিন কাটাবেন। মানুষের দুঃখের আরেক দিক দেখা হলো এই বাগদাদের প্রবাস জীবনে।

নাইফ পেইন্টিং

কুর্দিস্থান থেকে বাগদাদে বেড়াতে এলে একেক সময় একেক হোটেলে থাকতাম। প্রথমে ছিলাম ফন্দুক কান্দিল বা কান্দিল হোটেলে তখন বাগদাদে নতুন, সবকিছুই কেমন যেন থমথমে লাগত। বিদেশীদের জন্য বাগদাদ তখন আমন্ত্রনের হাতটা গুটিয়ে নিয়েছিল। সাধারণ হোটেল গুলো পর্যটকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিদেশীদের জন্য নিরাপত্তার অজুহাতে দুই তিনটা ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকার আদেশ ছিল । কান্দিল হোটেলের পাশে কারাদা রোড। এটা বাগদাদের মোটামুটি পরিচিত রাস্তা। এ রাস্তার দুপাশে অনেক মার্কেট আছে। সন্ধ্যায় কাজ না থাকলে কারাদা রোড দিয়ে হাঁটতে বেরোতাম। হাঁটতে হাটতে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে কোন খাবারের দোকানে ঢুকে পড়তাম। প্রায় দোকান গুলোতে সোয়ার্মা পাওয়া যেত। বিশাল লোহার শিকে স্তরে স্তরে মাংশের টুকরো ঢুকিয়ে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। মাংশের নিজস্ব চর্বি গলে মাংস পুড়িয়ে নরম করছে। বাড়তি কোন মশলার তেমন ব্যবহার দেখিনি। কেউ চাইলে দক্ষ হাতে ছুরি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাংস কেটে লম্বা মতন পাউরুটিতে ভরে শশা টমাটোর সালাদ সহ হাতে ধরিয়ে দিত। দাম মামুলী ২৫০ দিনার। ১ ডলারে তখন প্রায় ১৮০০ ইরাকী দিনার পাওয়া যেত। এর সাথে লেমন ড্রিংকস ২০০ দিনার দিয়ে খেলে চমৎকার ডিনার হয়ে যেত। রাস্তা দিয়ে হাটতে হাটতে দেখলাম কয়েক জন আর্টিষ্ট রাস্তার পাশে বসে ক্যানভাসে ছবি আঁকছে। পাশেই বহু আর্ট গ্যালারী, পেইন্টিং এ ভর্তি, কৌতুহল হওয়াতে কাছে গেলাম। ছোট ছোট পটের মধ্যে রং, কোন ব্রাস নেই একটা ছুরিতে একটু রং নিয়ে ছুড়ির খোঁচায় ছবি আঁকছে। এগুলো নাইফ পেইন্টিং। বাগদাদের চিত্রশিল্পীরা এভাবে তাদের ছবি গুলো আঁকে। বংশ পরম্পরায় তারা শিল্পী এবং এই অভাবের দিনেও তাঁরা এঁকে যাচ্ছে জীবনের ছবি। আহমেদ মোহাম্মদ এদের খুব কমন নাম। বিদেশীদের কাছে এই নামই বলে। সালাম দিয়ে তরুন একজন আর্টিষ্ট এর পাশে বসলাম, হাসি মুখে বসতে বলল। আমাদের সামনেই অল্প একটু কালচে রং এ ছুরি ডুবিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে একটা ছবি এঁকে দিল। দশ ডলারে এ ধরনের ছবি বেশ কয়েকটা বিক্রি করে। তবে

হাজার ডলারেরও ছবি আছে, ছবি যারা বোঝে তারা তা কিনে নিয়ে যায়। মুলত বিদেশীরাই এই ছবির ক্রেতা। আমরা তার পাশে বসে কিছুক্ষণ ছবি আঁকা দেখছিলাম। তার বাবা যুদ্ধে মারা গেছে তিনিও শিল্পী ছিলেন। বাপের পেশাতে ছেলে যোগ দিয়েছে। অন্য কিছু করতে তার ভাল লাগেনা। একটু ছরির খোঁচায় তার হাত দিয়ে একটার পর একটা ছবি বের হচ্ছে। বাগদাদের জীবন,বেদুইন বসতি,বাজার এর জন

সমাগম,জলমগ্ন এলাকার বাড়ীঘর আরো কত দৃশ্য। জাহাজ, নৌকার ছবিও অনেক আছে। কারা কিনে এই ছবি একথা বলায় সে বলল অনেকেই আসে তবে আগে অনেক ক্রেতা ছিল এখন কম তাই মুখটা শুকনো অভাব এখন চারধারে হানা দিয়েছে। আমরা থাকতে থাকতেই বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় গ্যালারী গুলোতে ঢুকে বড় বড় আকর্ষণীয় পেইন্টিং কেনাকাটা করছিল। অনেকগুলো কেনার পর মোটা প্লাষ্টিকের ড্রামে রোল করে গাড়ীতে করে নিয়ে যায়। পরে তুরস্ক কিংবা জর্ডান দিয়ে নিজ দেশে তা পাঠিয়ে দেয়। দেশে এভাবে ছবি আঁকা দেখা ও কেনার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। ভাল লেগে গেল ছবি গুলো দেখে। বাগদাদের শিল্পীরা অপূর্ব পেট্রেট আঁকতে পারে। অনেক মানুষ বিভিন্ন সাইজের পোট্রেট বানাচ্ছে। ১০ ডলার থেকে শুরু করে ১০০ ডলার দিয়েও কেউ কেউ নিজের পোট্রেট একে নিচ্ছে। বাঁধাই করলে অসুবিধা হবে বলে রোল করে এসব ছবি নিয়ে যায়। পোট্রেট আঁকাতে হলে ছুটির দিনে সময় করে আসতে হয় এবং শিল্পীকে বেশ কিছু সময় দিতে হয়। এছাড়াও ছোট ছবি দিলেও তারা তা থেকে প্রোট্রেট এঁকে দেয়। নিজের ছবি আকানোর ইচ্ছে ছিল না বলে পোট্রেট এর অর্ডার দেয়া হয়নি। আমাদের সাথে ডেনিশ ও ডাচরা বহু ছবি কিনে নিত। একবার তাদেরকে এত ছবি কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলল ইউরোপে এসব ছবির বেশ কদর। এখানে পাঁচ দশ ডলারে যে ছবি কেনা হচ্ছে ইউরোপে তা অনেক চড়া মূল্যে বিক্রি করা যাবে। বুঝতে পারলাম ব্যবসায়িক কারণে দিনারের অবমূল্যায়নের সুযোগে তারা দামী পেইন্টিং গুলো সংগ্রহ করছে। মোহাম্মদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে জানলাম এই ছবি বিক্রির টাকায় তার সংসার চলে। যখন ভাল বিক্রি হয় তখন মনটা খুশীতে ভরে উঠে। মাঝে মাঝে তেমন বিক্রি হয় না তখন ক্লান্ত দেহে ঘরে ফেরা। মানুষ গুলো যেন দুঃখ বোধকে সহজ ভাবে গ্রহন করে নিতে শিখে গেছে। কয়েকটা ছবি কিনব বলাতে খুশি হয়ে আমাদেরকে তার আঁকা ছবি দেখিয়ে তার মধ্য থেকে পছন্দ করতে বলল। আমরা কজন দেখে দেখে ইরাকের স্মৃতি হিসেবে যেগুলো ভাল লাগল সেগুলো কিনলাম। মোহাম্মদ খুশি হয়ে আমাদের সামনেই রং দিয়ে একটা ছবি এঁকে উপহার হিসেবে দিল। বলল এটা আমার পক্ষ থেকে, আমাকে মনে রেখো। তার হাসিমুখ দেখে ছবি গুলো নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

মসুল শহরে

হযরত ইউনুছ (আঃ) এর মাজার, মসুল

ইরাকে অবস্থান কালীন সময়ে মসুল শহর দেখার জন্য অনুমতি চাইলাম । বাগদাদ থেকে উত্তরের সবচেয়ে বৃহত্তর প্রদেশ হচ্ছে নিনেভে। এর রাজধানী শহর হচ্ছে মসুল। বাগদাদ থেকে চার শ' কি.মি. উত্তরে। বর্তমানে যোগাযোগ হচ্ছে রেল ও সড়ক পথে। সড়ক মসুল হয়ে চলে গেছে সিরিয়া ও তুরস্কের পথে। ইরাকের উত্তরাংশের তিনটি প্রদেশ অর্থাৎ ইরবিল,ডহুক ও সোলায়মানিয়া দিকের বেশির ভাগ রাস্তা শুরু হয়েছে মসুল থেকে। ইরাকের কিছু কিছু প্রদেশে বেড়াতে গেলে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিতে হয় । আমরা ধর্ম মন্ত্রনালয়ের অনুমতি চাইলাম । মসুল শহরে অনেক নবীর মাজার এবং হযরত জর্জিস (আঃ) এর মাজারে রসুল (সাঃ) এর দাঁড়ি মোবারক সংরক্ষিত আছে । মুসলমান হওয়ার সুবাদে অনুমতি মিলল । ধর্ম মন্ত্রনালয় থেকে একজন লিয়াজোঁ অফিসার আমাদেরকে দিল । মসুল ইরাকের একটা অন্যতম প্রধান শহর । এই শহরে বেশ কিছু তেলক্ষেত্র আছে এবং নিয়মিত উত্তোলন হচ্ছে এসব ক্ষেত্র থেকে । হযরত জর্জিস (আঃ) এর মাজার মসুলের পুরানো এলাকায় । নতুন শহরের মত এর রাস্তাঘাট চওড়া না, তবে গাড়ী চলে । এলাকাটা তেমন উন্নত না মানুষও তেমন নেই । গাড়ী থেকে নেমে গলি পথে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে গেলাম । গলির দুপাশে ছোট ছোট ঘর । পরে জানলাম এসব জায়গায় আগে ইরাকের ইহুদীরা থাকত । তাদের থাকার জায়গা গুলোও কেমন যেন সুরক্ষিত । এখন এরা ইরাক থেকে চলে গেছে । তাই দরিদ্র জনগন এসব জায়গায় দখল করে নিয়েছে । ইনি বনি ইস্রাইল বংশীয় নবী । আগেকার দিনে নবীদের মাজার গুলো ইহুদী উপাসনালয় বা সিনাগগ এর মত । ত্রিশুলের মত সলাকা ছিল । বর্তমানে তা মসজিদ এবং ত্রিশুল

এর একটা শলাকা বাদ দিয়ে চাঁদের আকৃতি দেয়া হয়েছে তা বুঝা যায় । মসজিদ বেশ বড় অনেক লোকজনের নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে । আমরা অজু করে ভিতরে প্রবেশ করলাম । লিয়াজোঁ অফিসার মসজিদের কেয়ারটেকার এর সাথে কথা বলল । তালা দিয়ে সীল করে রাখা একটা আলমারিতে রসুল (আঃ) এর দাঁড়ি মোবারক সযত্নে রাখা । আমাদেরকে সিল খুলে দেখালো । একটা কাঁচের শিশির মধ্যে এয়ার টাইট অবস্থায় একগোছা দাঁড়ি মোবারক দেখলাম সুবহানাল্লাহ । মেহেদীর রং এর মত স্বচ্ছ । আমরা দু রাকাত নফল নামাজ পড়লাম । তারপর নবীর সমাধি দেখতে গেলাম । কবর এখন অনেক নীচে চলে গেছে । এক সময় এটা পানির নীচে ডুবে গিয়েছিল,এখন পানি সরিয়ে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে । একসময় ইহুদীরা এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করত । জীবনে প্রথম বারের মত একজন নবীর মাজার যেয়ারত করার সৌভাগ্য হলো, আমিন ।

এরপর আমরা নিমরদ শহর দেখতে গেলাম । এটা অনেক প্রাচীন শহর । অ্যাসিরিয়ানরা এর পত্তন করেছিল । সম্রাট আসুর নাসুর পাল এটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । বর্তমানে এটা ধ্বংস প্রাপ্ত নগরী । অনেকে বলে নমরুদ এখানে ছিল কেউ আবার বলে এই নমরুদ কোরআনের সেই নমরুদ না । বেশ কিছু বিশাল সিংহজাতীয় মূর্তি এখানে আছে । তা ছাড়া ভাংগা ও ধ্বংস হওয়া নগরীর চিহ্ন এখানে আছে । পর্যটকদের জন্য এখানে লিফলেট পাওয়া যায় এ শহরের তথ্য সমৃদ্ধ । আমরা একটা লিফলেট কিনলাম । দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল । ফোরাত নদীর পারে একটা রেস্তোরাতে গেলাম খাবার খেতে । নদীর পারে পানির কিনার ছুঁয়ে অসংখ্য রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে উন্মুক্ত আকাশের নিচে টেবিল-চেয়ার পেতে খাবারের ব্যবস্তা। এসব রেস্তোরাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে, বিশেষভাবে তৈরী মাছ, আগুনে পুড়িয়ে মাছ রোস্ট করে দেয় এখানে বলে মাসগুফ। । লিয়াজোঁ অফিসারকেও আমাদের সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলাম । চিকের টিক্কা কোক ও রুটি দিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম । খাবার শেষ করে হযরত ইউনুস (আঃ) এর মাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । হযরত ইউনুস (আঃ) এর কথা আমরা অনেক গল্পে ও কোরানের মাধ্যমে জেনেছি । আজ সেই নবীর মাজার যিয়ারত করার সৌভাগ্য হলো । পাহাড়ের চুড়ায় হযরত ইউনুছ (আঃ) এর মাজার । স্থানীয় লোকেরা বলে নবী এ ইউনুস (আঃ) গাড়ী দিয়ে ঘুরে ঘুরে মাজার প্রাঙ্গনে গেলাম । বিশাল চত্তর বেশ বড় এলাকা নিয়ে মসজিদ ও মাজার । অনেক লোকজন ভিতরে আছে । দোয়া দরুদ পড়ছে বাহির থেকেও অনেক মুসলিম পর্যটক এই মাজার যিয়ারত ও মসজিদে নামাজ পড়তে আসে । পহাড়ের চুড়ায় বলে এখান থেকে মসুল শহরটাকে দেখা যায় বেশ সুন্দর ভাবে । আজকের দিনটা আমার কাছে বেশ স্মরণীয় । কারণ

মুসলমান হিসেবে পূর্ববর্তী নবীদের মাজার দেখার সৌভাগ্য আল্লাহপাক আমাকে দিলেন । মাজার গুলো দেখতে দেখতে ছবি তোলার কথা ভুলে গেলাম কেন যেন । দোয়া দরুদ ই মুখ্য হয়ে উঠল তখন । এরপর আমরা হযরত দানিয়েল (আঃ) ও হযরত শীষ (আঃ) এর মাজার দেখতে গেলাম । হযরত দানিয়েল (আঃ) এর মাজার খোলামেলা । মসজিদের সামনে পাকা উঠানের মত খোলা এলাকা । লোকজন তেমন নেই । কেউ কিছু বলতেও পারে না । লিয়াজোঁ অফিসার আমাদেরকে বলে দিল । এই মাজার সংরক্ষণের কি ব্যবস্থা তা জানতে পারলাম না । তবে তেমন যে ভালভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না তা বুঝা যায় । ভেতরে ৪/৫ জন লোক উনারা হয়ত দেখাশোনার দায়িত্বে । এরপর হযরত শীষ (আঃ) এর মাজারে গেলাম । উচ্চরনে একটু ভিন্নতা থাকলেও বুঝতে পারলাম এটা শীষ (আঃ) এর মাজার । অনেক পুরানো মাজার পাশেই মসজিদ । লোকজন তেমন একটা নেই । লোকালয় থেকে একটু দুরে বলেও মনে হলো । স্থানীয় অধিবাসীরা হয়ত দেখতে দেখতে এখন আর তেমন আসে না । আসলে গোটা ইরাক ই ইসলামী সভ্যতার তীর্থভূমি তাই সারা ইরাক জুড়ে শত শত পয়গম্বর শুয়ে আছেন । আজকের দিনটা শেষ হচ্ছিল অনেক আনন্দ নিয়ে । আমাদেরকে ফিরতে হবে আমাদের শহরে । কিন্তু কোন তাড়া অনুভব করছিলাম না । এক বছর ইরাক অবস্থানে যদিও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ জায়গাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল । আজ মনে হচ্ছিল একটা ঐতিহাসিক দিন । আল্লাহতায়ালা পয়গম্বর পাঠিয়ে মানুষকে সোজা পথে চলার জন্য হেদায়েত করেন । আমরা সেই পূণ্যভূমি থেকে অনেক দুরের বাংলাদেশের মানুষ হয়েও আল্লাহতায়ালা সৌভাগ্য দিলেন । তাঁর প্রিয় বান্দাদের মাজার ও মসজিদ দেখার ও তাঁদের জন্য দোয়া করার এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ।আমিন ।

নাজাফ,কারবালা,কুফা ও ব্যাবিলনে কিছুক্ষণ

রাজধানী বাগদাদে বেড়াতে আসলে আমরা কোন না কোন জায়গা দেখতে বের হয়ে পড়তাম । বাগদাদ ও তার আশেপাশের এলাকায় প্রচুর ঐতিহাসিক স্থাপনা ও এলাকা আছে । এবার যখন বাগদাদে এলাম তখন ঠিক করলাম নাজাফ,কারবালা ও কুফা দেখব । প্রথমে ট্যাক্সি স্টেশনে এলাম । সেখানে বড় ও মজবুত ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। মরুভূমির পথ। ট্যাক্সিতে এসি ভাল কাজ করে না । সাথে পানি নিলাম । বিসমিল্লাহ বলে রওয়ানা হয়ে গেলাম । বাগদাদের সীমানা পার হলেই মরুভূমির মত এলাকা, বেশ উত্তপ্ত । কারবালা বাগদাদ থেকে একশ'দুই কিলোমিটার দূরে, কারবালা যেতে দুইটা চেক পয়েন্ট আছে । সেখানে গাড়ী থামানোর পর কাগজপত্র দেখাতে হয় । মুসলমান ও বাংলাদেশী বলায় আমাদেরকে যেতে দিল । এর পরের চেক পয়েন্টে তেমন আর কোন চেক করল না । মধ্যবর্তী এলাকা মরুময় তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যায় না ।

কারবালা

প্রথমে কারাবালা এলাকায় গেলাম । কারবালা প্রদেশের রাজধানী কারবালা শহর। ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং তার ভাই আব্বাসের মাজার রয়েছে যেখানে সেটাই ছিল যুদ্ধক্ষেত্র। শত শত বছরে মরুভূমি রুপ নিয়েছে আধুনিক নগরী হিসাবে। এগুলো শিয়া প্রধান অঞ্চল । হযরত হোসেন ও হযরত আব্বাস (রাঃ) এর মাজার দুটো একরকম দেখতে, বিশাল এলাকা জুড়ে মসজিদ । এই মসজিদ গুলোর বৈশিষ্ট্য একটু অন্য রকম । মসজিদের মুল ভবন এ ঢুকতে হলে গেইটের মত আছে তারপর চারপাশ দিয়ে করিডোরের মত লেন বানানো এবং এরপর বিশাল পাকা । ফাঁকা এলাকা এখানে অনেক লোকজন বসতে পারে । রোদের তাপ অত্যন্ত বেশী বলে সবাই পাশের ছায়াতে বসে আছে। লোকজনদেরকে দেখলে মনে হয় এরা অনেক দিনের জন্য এখানে এসেছে । মসজিদ অনেক কারুকাজ করা কিছু কিছু জায়গা সোনা কিংবা পেতলে মোড়ানো মনে হলো । মসজিদের ভেতরটাও অনেক কারুকার্য খচিত যা সাধারণত সুন্নি মসজিদগুলোতে দেখা যায় না । সবাই একটা মাটির টুকরা সেজদার জায়গায় রেখে সেখানে সেজদা দেয় । এটা নাকি কারবালার মাটি । মসজিদেও এধরনের টুকরা পাওয়া যায় । কেনাও যায় বাইরের দোকানে । আমরা কিছুক্ষণ ঘুরে বাইরে এলাম । হযরত আব্বাস (রাঃ) এর মাজারও একই রকম । সিয়ারা দুজনকেই সমান সম্মান করে বলে মনে হলো । ইনিও হযরত আলী (রাঃ) এর আর একজন সন্তান । বাইরে প্রচুর গরম সরবত পানিপুর্ণ ফল বিক্রি করছে বিক্রেতারা । আমরা ফল কিনে খেলাম । প্রায় এক ঘন্টা সেখানে ছিলাম । আমাদের চেহারা ও চালচলন দেখে লোকজন বুঝল আমরা ভারতীয় এবং অবশ্যই শিয়া না । আমাদেরকে দু একজন জিজ্ঞাসা করায়

বললাম বাংলাদেশী মুসলমান ওরা এতেই খুশি । আমাদের দেশের শিয়া সুন্নী এরা তেমন পার্থক্য করে না । মুসলমান জেনেই খুশী । এক ঘন্টা প্রায় হয়ে গেল কখন যেন।

নাজাফ

এবারের গন্তব্য নাজাফ । নাজাফ ইরাকের আঠারটি গভর্নরেটের একটি। নাজাফ কুফারই অংশ,কুফায় রয়েছে হজরত আলীর (রাঃ) বাড়ী। কারবালা থেকে নাজাফ থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার , বাগদাদ থেকে কারবালা গেলে পথে পথে প্রচুর গাছপালা এবং সবুজ চোখে পড়ে। কিন্তু নাজাফ যেতে শুধু ধু-ধু মরুভূমি , এখানে হজরত আলীর (রাঃ) মাজার রয়েছে। কথিত আছে নাজাফ এ হযরত আলী (রাঃ) কে দাফন করা হয়েছে । এখানে হযরত আলী (রাঃ) মাজার ও মসজিদ আছে । প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল ট্যাক্সিতে নাজাফ আসতে । সূর্যের প্রচন্ড তাপে বোতলের পনি গরম হয়ে গেছে । সেই পানি খাচ্ছি । এক কেজি আলু বোখারা কিনলাম পানিযুক্ত ফল,টমাটোর মত মধ্যখানে বিচি খেতে খারাপ না । আমাদের দেশে শুকনা আলু বোখারা বিরিয়ানীতে দেয় । গরমের দেশ ও মরুভূমিতে এই ফল গুলো সঞ্জীবনীর মত কাজ দেয় । হযরত আলী (রাঃ) মসজিদেও সিয়াদের প্রাধান্য, সুন্নী কাউকে দেখিনি। যদিও দেখে বোঝার উপায় নাই । তবে এরা এখানে আসে না বলে মনে হলো । এখানে মানুষ জন বাইরের লোক সম্বন্ধে বেশ সজাগ ও তারা নতুন কেউ এলাকায় ঢুকলে ফলো করে পরিচয় জেনে নেয় । ইরাকে শিয়া সুন্নীর মধ্যে দ্বন্দ বেশ প্রকট এবং মারামারি হানাহানিও হয় মাঝে মাঝে । দেয়ালের গায়ে অঙ্কিত নকশা চেয়ে দেখার মতো,সূক্ষ্ম তার কারুকাজ। । সামনের পিছনের দুপাশের নারী-পুরুষেরা কেউ নামাজ পড়ছে,কেউ কুরআন শরীফ পড়ছে,কেউ ঘেরা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে,কেউ বা কাঁদছে। বাইরে মাজার সংলগ্ন

বাজারে বোরকা পরিহিত অসংখ্য নারী খুচরা দোকান নিয়ে বসেছে কেউ চায়ের দোকান সাজিয়ে বসেছে, কেউ টুপি তসবি, কেউবা অন্য কিছু।সুন্নী শাসিত সাদ্দাম সরকারের কাছে শিয়ারা নিরাপদ বোধ করে না ।

কুফা মসজিদ

এরপর কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম । এখানে যে মসজিদে হযরত আলী (রাঃ) কে হত্যা করা হয় সেখানে গেলাম । এটাও শিয়া কায়দায় বানানো বিশাল পাকা উঠোন মাঝখানে সেই উঠোনের মাঝখানে একটা জায়গা গোল করে ঘেরা । কথিত আছে এটা সেই জায়গা যেখানে হযরত আলী (রাঃ)কে হত্যা করা হয়েছিল । মসজিদের ভেতরে গেলাম অনেক সিয়া ভক্ত সেখানে দোয়া পড়ছে, কেউ নামাজ পড়ছে। এইসব মসজিদের লোকজন দীর্ঘদিন থাকে ভিক্ষুকও দেখা যায় । আমার একটা সাধারণ পর্যবেক্ষণ হলো যে মসজিদ গুলো কেন যেন পরিষ্কার না । একটা গুমট গন্ধ পাওয়া যায় । হয়তো পানির অভাব ঘাম ও গোসল কম করার সুযোগ থেকে এসব গন্ধ সৃষ্টি হতেও পারে ।

মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত আলী (রাঃ)এর বাড়ীতে গেলাম । বাড়ীর চারপাশ দেয়াল ঘেরা । এর ভেতর সেই প্রাচীন কালের মাটির ঘর ছোট ছোট কামরা গাইড বলে এগুলোতে হযরত আলী (রাঃ) এর পরিবার থাকতেন । বাইরে থেকে বাড়ির ভিতরটা বোঝার উপায় নেই। বাড়ীটি দুইটি অংশে ভাগ করা। মাঝখানে ছাদহীন খোলা জায়গা। দুই অংশ মিলে ছোট বড় আট-দশটি কোঠা রয়েছে। একটি রুম দেখিয়ে গাইড বললেন, ওটাতে মৃত্যুর পরে হজরত আলীকে (রাঃ) এনে রাখা হয়েছিল। বাড়ীর ভেতর একটা পানির কুপ আছে । কথিত আছে এখান থেকে তাঁরা পানি তুলতেন । পানি তুলে পান করার জন্য দর্শনার্থীদের দেয়া হচ্ছে। ভক্তি ভরে সবাই পান করছে। এখন অবশ্য এই কুপ ব্যবহার হয় না । সংরক্ষণ করা আছে ।

শুক্রবার কিন্তু এখানে জুম্মার নামাজ হয় না । আমরা কসরের নামাজ পড়লাম । হযরত আলী (রাঃ) বাড়ীর অনতিদুরে এজিদের প্রাসাদ । বিশাল বাড়ী এখন দেয়াল আছে মাটির নীচে দেবে গেছে । ময়লা নোংরা জলাভূমির মত এলাকা হয়ে আছে ।

কুফা

কুফায় হজরত ওমরের (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত আল-ওমরা প্যালেস,কুফা মসজিদ হজরত আলীর (রাঃ) বাড়ী-সংলগ্ন। হযরত ওমর (রাঃ) তার খেলাফত পরিচালনার জন্য এই মূল ভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরো প্যালেস দুই পর্যায়ে চতুষ্কোণ দেয়াল পরিবেষ্টিত। বাইরের চার মিটার চওড়া দেয়ালের উপর দিয়ে হাঁটা যায়। এসব জিনিষ ও নিদর্শন না আসলে বোঝা যেত না । মনে মনে ভাবি সেই কত শত বছর আগে মানুষ উটের পিঠে কিংবা ঘোড়ায় চড়ে এসব মরুময় অঞ্চলে তীব্র উত্তাপের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল এবং শহীদ হয়েছে। আমরা টেক্সি করে ভাল পিচঢালা রাস্তা দিয়ে এসেও টায়ার্ড । এখন দোকান পাট খাবার পানি, সবই আছে । তখনতো কিছুই ছিল না এই মরু প্রান্তরে । আল্লার কাছে তাই হাজার শোকর করলাম ভাল আছি এজন্য । নাজাফ কারবালা ও কুফা দেখার পর আমরা ব্যাবিলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম ।

ব্যাবিলনে কিছুক্ষণ

মনে অনেক আগ্রহ কি না কি দেখব । ছোটবেলায় বইয়ে পড়েছি ব্যাবিলনীয় প্রাচীন সভ্যতার কথা। পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি ব্যাবিলনের শূন্যদ্দ্যান । ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানের কথা মনের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাগদাদ থেকে নব্বই কিলোমিটার দক্ষিণে ব্যাবিলন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৫-৫৬৩ সময়কালে রাজা নেবুচাদ নেজার এর পুনঃনির্মাণ করেন। নেবুচাদ নেজারের আমলে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য শীর্ষে পৌঁছে। এক ঘন্টা চলার পর ব্যাবিলনের কাছে একটা হোটেলে লাঞ্চ করার জন্য থামলাম । ড্রাইভার সহ আমরা ভাত চিকেন ও ভেজিটেবল খেলাম । ইরাকী ষ্টাইলে রান্না । ভাজাভাত ঝোল মসলার অন্য এক স্বাদের মুরগীর মাংস । যাক খিদে পেটে সব হজম হয়ে যায় । প্রায় ৮২৫০ ইরাকী দিনার বিল দিলাম । ১০ ডলারের কম হবে তখনকার হিসেবে । খাওয়া শেষে আবার যাত্রা শুরু । পথে মরুভূমির মধ্য খানে বিশাল এক উটের পাল রাস্তা অতিক্রম করছে । আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে ছবি তুললাম । মুরুভূমির চিরচেনা দৃশ্য সেই মরু জাহাজ উট । বিশাল কিন্তু শান্ত প্রাণী কোন দিকে না দেখে সোজা গন্তব্যে চলছে । বিশাল উটের বহর । ইরাক প্রাকৃতিক দিক থেকে আশ্চর্য এক মিশ্রণ। শত শত মাইল জুড়ে ধু-ধু খাঁখাঁ মরুভূমি যেমন আছে,তেমনই আছে চোখ জুড়ানো সবুজ। পথে পথে দেখলাম ভুট্টার ক্ষেত আর ফলের বাগান। ছোট ছোট গাছে জড়িয়ে আছে ডালিম আর পিয়ার। পিয়ার পেকে নরম হবার পূর্বে কচকচে খেতে মজা। আছে খেজুরের বাগান।

ব্যাবিলনের গেইট

এরপর ব্যাবিলনের গেইটে এলাম, কোথায় উদ্যান, কিছুই দেখি না । বিশাল দুর্গের গেইটের মত দুটো পিলার ইটের তৈরী মধ্যে মাটি দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর নক্সা আঁকা, গাইড আছে । গাইড বই নিলাম একটা । আস্তে আস্তে ভেতরে গেলাম । ব্যাবিলন পরিখা এবং দেয়াল দ্বারা দুই পর্যায়ে পরিবেষ্ঠিত ছিল বলে জানা যায়। বাইরের দিকের দেয়াল ষোল কি.মি এবং ভিতরের দিকের দেয়াল আট কি.মি.লম্বা ছিল। আমরা এলাকায় ঢুকে যেহেতু ডাইনে-বাঁয়ে কোথায় কী প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। গাইড প্রাচীন কালের কথা গুলো বর্ণনা করে যাচ্ছিল । এটাকে শুন্যদ্যান বলা হয় , কারন এর অনেক উঁচু উঁচু প্রাচীরের উপর তখনকার সময় ফুলের গাছ লাগানো থাকত । নীচ থেকে ধাপে ধাপে প্রাচীর উপরে উঠে গিয়েছিল এবং সেই সব ধাপে ফুলের গাছ গুলোকে দুর থেকে মনে হতো যেন শুন্যে বাগান সাজানো রয়েছে । এখন সে সব কিছু নেই । তবে পুরু দেয়াল গুলোর কিছু কিছু পুনঃ নির্মান করা হয়েছে । এলাকার উত্তর অংশে মূল প্যালেসে রয়েছে 'লায়ন অব ব্যাবিলন' দেবী ইশতার এর প্রতীক, পাথরের অর্ধেক সিংহ অর্ধেক মানুষ এর মূর্তি এটা ছিল এখানকার দেবতা ও রক্ষক। এখন মূর্তিটা কিছুটা ভেংগে গেছে । ভেতরে অনেক গুলো কক্ষ আছে । প্রসাদের কোথায় যুদ্ধ হতো মানুষকে ফাঁসি দেয়া হতো এসব জায়গা গুলো গাইড আমাদের দেখালো । অনেকটা গোলক ধাধার মত লাগে । ঠিকমত গাইড না পেলে ভেতরে পথ হারানো অতি সোজা । সব বাঁক ও দেয়াল প্রায় একরকম মনে হয় ও একবার দিক হারালে অনেকক্ষণ এই রোদের তাপে ঘুরতে হয় দর্শকদের । গাইড আমাদের বের করে নিয়ে আসল ঠিক ভাবে । আজকের ঘটনা বহুল দিনটাতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো । এই দুটো চোখ দিয়ে আল্লাহতায়ালা ধর্মীয় স্থান ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান গুলো দেখালেন আমিন ।

লায়ন অব ব্যাবিলন

এবারের বাগদাদের অবস্থান ঘটনা বহুল হলো । হোটেলে ফিরে এলাম ট্যাক্সিতে করে । বিকেলে ফ্রেস হয়ে রেষ্ট নিলাম । এরপর বাগদাদের আল রশিদ ষ্ট্রীটে হাটতে বের হলাম । আজকের দিনের তোলা ছবি গুলো ওয়াশ করলাম । এখানকার ষ্টুডিওতে । খরচ প্রায় বাংলাদেশের মতই । একটা গানের ক্যাসেট কিনলাম । আরবী ভাষার গান । তখনকার সময়ের বেশ হিট ও ফেমাস গায়িকা ডায়ানা হাদ্দাদ এর, লে ইয়া হাবিবি তাফা হাই ফাই গানটা অনেক শুনেছি এখানে । এখন নিজের কাছে সংগ্রহের জন্য ক্যাসেট কিনলাম । ঘটনা বহুল দিনটার সমাপ্তি রাতে নেমে এলো ।

shovonshams@yahoo.com

continue part 1/5